জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও মেথডোলজি

প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন

অনুবাদ

বুরহান উদ্দিন আজাদ

ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
معهد التفكر والبحوث الإسلامي
Institute of Islamic Thought and Research

আমাদের কথা

১.

জ্ঞানের পুনর্জাগরণ পরিভাষাটি নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, তখন প্রথমেই প্রশ্ন আসে যে, জ্ঞান মৃত্যুবরণ করে কীনা? এ প্রশ্নের জবাবে যুগের প্রখ্যাত আলেম, উসূলবিদ ও মুতাফাক্কির প্রফেসর ড. মেহমেদ গরমেজ বলেন, 'জ্ঞান মৃত্যুবরণ করতে পারে। যে জ্ঞান যুগজিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারেনা, যুগের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে পারেনা, সে জ্ঞান মৃত'। এ কারণে, জ্ঞানকে গতিশীল রাখা, যুগের প্রশ্নের জবাবদানে সক্ষম করাই জ্ঞানের পুনর্জাগরণের প্রক্রিয়া। 'জ্ঞানের পুনর্জাগরণ' পরিভাষাটির সবচেয়ে সার্থক ব্যবহার আমরা দেখি, ইসলামী সভ্যতার সারমর্ম খ্যাত, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *'ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন'* গ্রন্থে। ইমাম গাজ্জালী এ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "জ্ঞানকে ইহইয়া করার জন্য আমি এ গ্রন্থটি লিখেছি। পূর্ববর্তী মহান ইমামগণের মেথডকে ব্যাখ্যা করার জন্য, এবং নবীগণ ও সালফে সালেহীনদের নিকট উপকারী জ্ঞান হিসেবে গৃহীত জ্ঞানসমূহকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এ গ্রন্থটি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, ইমাম গাজ্জালী জ্ঞানকে বিবেচনা করছেন উপকারিতার মানদণ্ডে, যা নবীগণ ও সালফে সালেহীনের নিকট গৃহীত। এজন্য আমরা গাজ্জালীর চিন্তায় ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানের ধারণার একটি সারমর্ম দেখি, যেখানে জ্ঞানকে বিচার করার মানদণ্ড হলো তা উপকারিতা।

প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন তাঁর গ্রন্থে এভাবেই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর যুক্তি হলো, জ্ঞানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার সময় আমরা বিভিন্নভাবে জ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে জ্ঞান নিয়ে আলাপ করতে হলে, জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের একটি সামগ্রিক বোঝাপড়া থাকা আবশ্যক।

২.

'জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও মেথডোলজি' মূলত প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুনের একটি বক্তব্য। এ আলোচনায় জ্ঞানের ইতিহাস, ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানের ধারণা, পাশ্চাত্য কীভাবে জ্ঞানের অর্থ পরিবর্তন করেছে, এবং জ্ঞানের পুনর্জাগরণের

পন্থা ও আমাদের করণীয় এ বিষয়গুলোকে তিনি হাজির করেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। নয়টি ভাষায় পাণ্ডিত্য, নানাবিধ শাস্ত্রীয় জ্ঞানে প্রগাঢ় অধিকার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে গভীরভাবে অধ্যয়নের সুবাদে প্রফেসর গরগুনের আলোচনা হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক।

প্রফেসর গরগুন দেখাচ্ছেন, সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা যেভাবে সৃষ্টিজগতকে ব্যাখ্যা করে, সারা দুনিয়ায় এ বিষয়টিই তখন গ্রহণযোগ্য ছিলো। এমনকি পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও এর আলোকেই সবকিছু ব্যাখ্যা করা হতো। পরবর্তীতে কান্টের মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা দুনিয়ায় ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে এ বিষয়টি গোটা দুনিয়ার জ্ঞানের গতিধারাকে পালটে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা সকল কিছুর উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে মানুষকে স্থান দেয়ায় গোটা দুনিয়াব্যাপী যে সংকট তৈরি হয়, সমগ্র মানবতা তার যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এজন্য প্রফেসর গরগুন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গারাউডির ভাষায় **'মানবতার উপর আগত একটি দুর্ঘটনা'** হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রফেসর গরগুন দেখাচ্ছেন, সভ্যতা হলো মানুষের চিন্তার প্রতিফলন। যেমনটা ইকবাল বলেছিলেন,

Civilization is a thought of the Powerful Man.

মুসলমানগণ সভ্যতা গড়ে তোলেন পয়গম্বরের অনুসরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ সুন্নতের মাধ্যমে। অপরদিকে, অন্যান্য আদর্শ/ধর্মের মানুষেরা তাদের চিন্তার আলোকে সভ্যতা গড়ে তোলে। এখানেই তিনি তুলে ধরেছেন যে, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা হলো পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের তৈরিকৃত চিন্তার ফলাফল। এমন একটি ব্যবস্থা যা নিজেকে সমালোচনার উর্দ্ধে বিবেচনা করেছে ও হাকীকতকে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে বর্তমান সময়কে Post Truth বলে আখ্যা দিচ্ছে। ফলে এখানে সংকট হলো, যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন ক্ষমতাসীন, তাই এ সভ্যতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমগ্র মানবতার জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করছে। এ ব্যবস্থার অধীনে থেকে হয়ত ব্যক্তিগত কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা সম্ভব, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ ব্যবস্থা সকল মানুষের জীবনকে গঠন করে দিচ্ছে। তিনি তুলে ধরেছেন যে, পাশ্চাত্যের অধীনে সমগ্র মানবতা ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট অতিবাহিত করছে।

প্রফেসর গরগুন এ সংকটের মাঝেও আত্মবিশ্বাসী। তাঁর যুক্তি হলো, মানবতার অবস্থা এরচেয়ে নিম্নদিকে যাওয়া অসম্ভব। তাই বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কে ভালোভাবে পর্যালোচনা করে যদি আমরা পদক্ষেপ নেই, তা সমগ্র মানবতার জন্য একটি নবদিগন্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাঁর মতে, এ সংকট থেকে মোকাবিলার পন্থা হচ্ছে জ্ঞানের পুনর্জাগরণ এবং সেটা এখনি। আমরা যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করেছি, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

এখানে আমাদের পছন্দের কোন সুযোগ নেই। অতএব প্রত্যেকের ভূমিকে ধারণ করা এবং নিজ অঞ্চলের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে জ্ঞানের পুনর্জাগরণের জন্য প্রচেষ্টা চালানোই আমাদেরকে একটি অর্থবহ সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে।

৩.

এ সংকট থেকে উত্তরণের পন্থা কী? প্রফেসর গরগুনের ভাষায়, আমরা যে অবস্থায় এবং যেখানে আছি, সেখান থেকেই জ্ঞানের পুনর্জাগরণের আন্দোলন শুরু করতে হবে। সময়ক্ষেপণ করার কোনো সুযোগ নেই। প্রফেসর গরগুনের মতে এখানে মৌলিক করণীয় ৩টি। যথাক্রমে–

- জ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা
- রাসূল (স) এর আমাদের সাথে সম্পর্ককে অর্থাৎ সুন্নতকে কেন্দ্রে রাখা
- ইনসানে কামিল হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো

তিনি পুরো পন্থাকে এভাবে সারসংক্ষেপ করেছেন।

তিনি দেখাচ্ছেন, বর্তমান দুনিয়ার ব্যবস্থা ও কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যের তৈরিকৃত। আমরা ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, এ কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য। পাশ্চাত্য নিজের ব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরি করেছে, সে কাউকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য না। স্বেচ্ছাচারীভাবে সমগ্র মানবতার উপর জুলুমপূর্ণ ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে মানবতাকে ধবংসের কিনারায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে।

পাশ্চাত্যের এ সর্বগ্রাসী অভিঘাতের সামনে তাহসিন গরগুন হীনমন্য নন। তাঁর চিন্তা কিংবা পন্থায় কোনোভাবেই আপোষকামী মনোভাব কিংবা হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পায়নি। তাঁর ভাষায়, পৃথিবীতে এখনো ২০০ কোটি মানুষ নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে এবং এটাকে বিশ্বাস করে। আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো আশার দিক এটি। এই সচেতন আত্মস্বীকৃতি আমাদের অস্তিত্বের মূল্যমান ও রূপরেখা নির্ধারণ করে।

প্রফেসরের গরগুনের মতে, আমাদের মৌলিক দায়িত্ব দুটি–

১. ইসলামী সভ্যতা সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে অবগত হওয়া। ইসলামী সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সহই আমাদের সভ্যতাকে ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সভ্যতার আলেম-ইমাম ও মুতাফাক্কিরগণের প্রচেষ্টার ব্যাপারে জানতে হবে এবং একে ধারাবাহিক রাখতে হবে।

২. আধুনিক জ্ঞান ও চিন্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে অবগত হতে হবে।

এর মাধ্যমে আমরা বহুমাত্রিকতা অর্জন করতে পারবো, এবং এ সংকটের বিপরীতে সমগ্র মানবতার জন্য একটি যৌক্তিক ও সামগ্রিক সমাধান হাজির করতে পারবো।

সমগ্র মানবতার প্রতি এটা আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৪.

প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন একজন জাত দার্শনিক। একালের বড় বড় সমালোচকেরা তাকে **'জ্ঞানের কুল্লিয়াত'** বলে আখ্যায়িত করেন। যিনি একইসাথে তত্ত্বও জানেন এবং নতুন দর্শন তৈরি করতে পারেন। একালের অন্যান্য চিন্তকদের ন্যায় নিছক তথ্যের সমাহার কিংবা নকলনবিশি নয়, বরং বহুবিধ বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় অধিকারের সুবাদে তাঁর প্রতিটি কাজই হয়ে উঠেছে একেকটি নতুন আবিষ্কার।

প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুনের জন্ম ১৯৬১ সালে, তুরস্কের সিভাস শহরে। সিভাস ইমাম-খতিব মাদরাসা থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তুরস্কের আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলাহিয়াত বিভাগে ভর্তি হোন। পরবর্তীতে পড়েছেন ফ্রাইয়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে উসূলে ফিকহ এবং দর্শনের উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনার পর তিনি দেশে ফিরে এসে '২৯মে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন। তিনি উসূলে ফিকহ, ইসলামী চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাস, উসমানী ও মাওয়ারাউন নাহর সভ্যতা, দর্শনের ভাষা, জ্ঞানতত্ত্ব, আখলাক, রাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তাফসীর, উসমানী খিলাফত ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সম্পর্ক ও পাশ্চাত্যের উপর উসমানী খিলাফতের প্রভাব, জার্মান আইডিয়ালিস্ট ফিলোসফি ও হেরমেনিউটিকের উপর গবেষণা করে যাচ্ছেন।

নানাবিধ বিষয়ে অধ্যয়ন, পাশ্চাত্য ও ইসলামকে গভীরভাবে আত্মস্থ করার ফলে তাহসিন গরগুনের যেকোনো আলোচনাই হয়ে উঠে সর্বোচ্চ সামগ্রিক। সভ্যতাবিশারদ ও মুতাফাক্কির এ আলেম যেভাবে সকল আদর্শ ও চিন্তার বিপরীতে যেয়ে ইসলামী সভ্যতার অপরিহার্যতাকে দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাবে উচ্চকিত করে তুলেছেন, একালে আর কেউ তা করতে সক্ষম হননি।

তাঁর অন্যান্য কাজের ন্যায় এটিও একটি অসাধারণ কাজ। কলেবরে ছোটো হলেও এ গ্রন্থটি একইসাথে পাশ্চাত্য দর্শনের একরকম ব্যবচ্ছেদ করে, ইসলামী সভ্যতার বহুমাত্রিক অবস্থান ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনন্যরূপে তুলে ধরেছে। একইসাথে প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুনের দার্শনিক উপলব্ধিজাত উপস্থাপনা এবং বহুবিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় অধিকার এ গ্রন্থে নতুন একটি মাত্রা যুক্ত করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক এবং জ্ঞান ও সভ্যতাবিষয়ক গবেষক বুরহান উদ্দিন আজাদ। উম্মতের বড় বড় দার্শনিক এবং আলেমগণের কাছে সরাসরি দারস গ্রহণ, দীর্ঘকালব্যাপী ইসলামী সভ্যতা, ইসলামী দর্শন এবং উসূল নিয়ে অধ্যয়ন, এবং তার দেড়যুগের অনুবাদের অভিজ্ঞতা এ গ্রন্থটিকে সাবলীল ও সুখপাঠ্য করেছে। একইসাথে আলোচিত জটিল বিষয়গুলোকে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন, গ্রন্থটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এধরণের তাত্ত্বিক একটি গ্রন্থ সর্বাধিক যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে অনুবাদ হয়েছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। বিষয় ও মানের বিচারে বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থটি অনন্য একটি সংযোজন হিসেবে পরিগণিত হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ এ অসাধারণ কাজের জন্য সম্মানিত অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান দিন।

জ্ঞানের পুনর্জাগরণের বিষয়ে এ গ্রন্থটি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট একটি ধারণা তুলে ধরবে বলে আমি আশাবাদী। একইসাথে ইসলামী চিন্তাদর্শনের তত্ত্বালোচনায় বাংলা ভাষার শূন্যতা পূরণেও গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন চিন্তাপরিসর, একাডেমিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ গ্রন্থের হাজিরকৃত আলোচনা নিয়ে নিয়মিত আলাপ হওয়া দরকার। কেননা, আজাদীর প্রথম শর্তই হলো মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি, এবং এক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি আমাদের জন্য পথের দিশা হতে পারে।

এ গ্রন্থের ব্যাপারে যেকোনো আলোচনা, পর্যালোচনা কিংবা সমালোচনাকে স্বাগত জানাই। প্রাসঙ্গিক বোধ হওয়ায় আমরা গ্রন্থের শেষে ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুনের সাথে অনলাইনযোগে আয়োজিত '*Talk with the Youth: Let's Discuss Civilization*' শীর্ষক আলোচনার চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যুক্ত করে দিয়েছি। আশাকরি সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

এ গ্রন্থে তথ্যগত কিংবা মুদ্রণজনিত কোন ত্রুটি থাকলে সরাসরি প্রকাশককে জানানোর অনুরোধ। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেবো ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে জ্ঞানের আন্দোলনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন।

সা'দ মুসান্না
মার্চ, ২০২৬
উত্তরা, ঢাকা

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুন। সভ্যতাবিশারদ আলেম, উসূলবিদ, দার্শনিক ও মুতাফাক্কির। একাধারে আটটি ভাষায় পারদর্শী এ বহুভাষী চিন্তাবিদ যেভাবে সকল আদর্শ ও চিন্তার বিপরীতে যেয়ে ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাবে উচ্চকিত করে তুলেছেন, একালে আর কেউ তা করতে সক্ষম হননি।

প্রফেসর ড. তাহসিন গরগুনের জন্ম ১৯৬১ সালে, তুরস্কের সিভাস শহরে। সিভাস ইমাম-খতিব মাদরাসা থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তুরস্কের আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলাহিয়াত বিভাগে ভর্তি হোন। আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর বৃত্তি নিয়ে তিনি জার্মানি গমন করেন এবং ফ্রাইয়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উসূলে ফিকহ এবং দর্শন শাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি থিসিস ছিলো, 'ভাষা, আচরণ এবং হুকুম'।

১৯৯৫ সালে তিনি তুরস্কে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন। তিনি পুনরায় জার্মানি গমন করেন এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষকতা করেন। জার্মানি থেকে তিনি পুনরায় তুরস্কে ফিরে আসেন এবং ২৯ মে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন।

প্রফেসর তাহসিন গরগুন যেসকল বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন সেগুলো হলো, উসূলে ফিকহ, ইসলামী চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাস, উসমানী ও মাওয়ারাউন নাহর সভ্যতা, দর্শনের ভাষা, জ্ঞানতত্ত্ব, আখলাক, রাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তাফসীর, উসমানী খিলাফত ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সম্পর্ক ও পাশ্চাত্যের উপর উসমানী খিলাফতের প্রভাব, জার্মান আইডিয়ালিস্ট ফিলোসফি ও হেরমেনিউটিক।

বিভিন্ন বিষয়ে তার লেখা তাঁর প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহ ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি উসমানী তারকিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, ল্যাটিনসহ ৮টি ভাষা জানেন।

তাঁর কিছু আলোচিত প্রবন্ধ হলো–

- ভাষাজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার দর্শন এবং বালাগাত।
- ইউরোপের অর্থসামাজিক গঠনে চালিকাশক্তি হিসেবে উসমানী খিলাফত।
- পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলামী জ্ঞান সম্ভব কিনা?
- আধুনিক জ্ঞানে দ্বীনি জ্ঞানের বিষয়সমূহে প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি।
- জ্ঞানের উৎস হিসেবে খাবারুস সাদিক।
- একটি সমস্যা হিসেবে আধুনিকতা।
- আধুনিক সভ্যতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞান আমাদের কী মূলনীতি দিয়েছে?"

তাঁর বেশকিছু প্রবন্ধ ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ২৯ মে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছেন এবং সমগ্র তুরস্কে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার দিয়ে যাচ্ছেন।

জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও মেথডোলজি

আধুনিক সময়ে জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভিত্তিগত একটি বিভাজন রয়েছে। ইবনে খালদুন, নাসিরউদ্দিন তুসী, কিনালিযাদে আলী এফেন্দিসহ আরও অনেকেই এ বিভাজন করেছেন। ফলশ্রুতিতে জ্ঞানের এ প্রকারভেদ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

আমাদের আলেমগণ সৃষ্টিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাক্রমে :

১. আল্লাহর ইরাদা এবং কুদরতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত সৃষ্টি।
২. মানুষের কর্ম। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষকে প্রদত্ত কুদরতের (সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন শক্তি) সাহায্যে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট বিষয়।

সৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে এ বিভাজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইম্যানুয়েল কান্টের পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত, বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্য এ বিভাজনকে ধারণ করতো।

ডেইজম[১], ন্যাচারাল ফিলোসফি[২], ন্যাচারাল ল[৩], ন্যাচারাল রিলিজিয়ন[৪]– এসকল বিষয় নিয়ে যত বিতর্ক হয়েছে তার মূলে ছিলো এ বিভাজন।

অর্থাৎ, আল্লাহ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তবে মানুষকেও তিনি কুদরত বা শক্তি দিয়েছেন। মানুষও তাকে প্রদত্ত এ শক্তির বদৌলতে নিজের একটি জগত সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের ক্ল্যাসিক চিন্তাধারায় যে 'কাসব' থিওরী[৫] রয়েছে, এ বিষয়টি সেটার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যাকে আমরা 'আল-আকলুল মুকতাসাব'[৬] বলে অভিহিত করে থাকি। 'মুকতাসাব আকল'; সৃষ্টির একটি পর্যায় তৈরি করে। আর সে পর্যায়টির বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ তার চিন্তার আলোকে সভ্যতা বা ব্যবস্থাপনাকে গড়ে তোলে। মুসলমানগণ একজন পয়গম্বরের অনুসরণ ও অনুকরণে এ সিস্টেম বা সভ্যতাকে গড়ে তুলে।

অপরদিকে অন্যান্য মানুষগণ তাদের বিশ্বাসকৃত মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সিস্টেম বা সভ্যতা গড়ে তোলে। এ শ্রেণিবিন্যাসটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যে সকলের নিকটেই গ্রহণযোগ্য ছিলো।

---

১. ডেইজমের অর্থ হলো, স্রষ্টা পৃথিবী ও সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সৃষ্টির পর আর দুনিয়ার সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা নেই। দুনিয়াকে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবও নেই। সৃষ্টি করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ।

২. ন্যাচারাল ফিলোসোফি প্রকৃতি এবং বস্তুজগতকে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝাপড়ার চেষ্টা। বিজ্ঞানকে পূর্বে ন্যাচারাল ফিলোসোফি বলা হতো। মূলত, ন্যাচারাল ফিলোসোফি হলো, এস্ট্রোনমি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির মতো জ্ঞানসমূহ। ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে মুসলমানগণ এ সকল বিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিলো। পাশ্চাত্য চিন্তার গঠনগত পর্যায়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা ইসলামী চিন্তা থেকে অনেক বেশী প্রভাবিত এবং উপকৃত হয়েছে। এমনকি ইসলামী সভ্যতার অসংখ্য গ্রন্থ পাশ্চাত্য নিজেদের মতো ভাবার্থ করে নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েছে। সে সময়ের বইগুলোতে এক পাশে ইংরেজি আর অন্যপাশে আরবী, এভাবে অনুবাদ করা হতো।

৩. ন্যাচারাল ল' হলো, প্রাকৃতিক ও নৈতিক আইন, যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে সকল স্থানে সমান, যা মানবপ্রকৃতি ও যুক্তি থেকে উৎসারিত। মানবসৃষ্ট কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত নয়।

৪. ন্যাচারাল রিলিজিয়ন হলো- যুক্তি, প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ এবং মানব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা। ন্যাচারাল রিলিজিয়ন–ধর্মগ্রন্থ, মুজিযা কিংবা পয়গম্বরের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে।

৫. কাসব থিওরী ইলমুল কালামে মানুষের কর্ম (ফি'ল) ও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য প্রণীত একটি তত্ত্ব বা থিওরী। এটি সবচেয়ে সুসংবদ্ধরূপে উপস্থাপন করেন ইমাম আবুল হাসান আল-আশয়ারী এবং এটি আশয়ারী ধারার কালামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব।

৬. মুকতাসাব আকল বলতে বোঝায় মানুষের জন্মগত মৌলিক অনুধাবনশক্তি (গারীযী/ফিতরী আকল)-এর সঙ্গে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীল অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতা। অর্থাৎ, জ্ঞানার্জন ও ইস্তিদলাল (যুক্তিগত অনুসিদ্ধান্ত) প্রক্রিয়ায় যে আকল বিকশিত ও পরিণত রূপ লাভ করে, সেটিই মুকতাসাব আকল।

আর এ ধারণাটি তারা মুসলমানদের নিকট থেকে নিয়েছিলো। অর্থাৎ, মানুষ তার নিজের তৈরি করা দুনিয়ায় বসবাস করে। এটাকে যারা উপলব্ধি করতে পারে, তাদেরকে হিউম্যানিস্ট নামে অভিহিত করা হয়। নিজেদের তৈরি করা এ জগতকে 'আল-হায়াতুদ দুনিয়া' বলা হয়। আপনারা জানেন এ পরিভাষাটি কোরআনে অনেক বার এসেছে। এখানে দুনিয়া নিজেই 'সিফাত'। দুনিয়া নিজেই সিফাত হওয়ার কারণে এর মওসুফ হলো 'হায়াত'[৭]।

'হায়াতুদ দুনিয়া' ও 'হায়াতুল আখিরা' এখানে হায়াত অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এর সিফাত পরিবর্তিত হয় তথা দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে হায়াতের সাথে 'আখেরাত' এসে যুক্ত হয়। হায়াতুদ দুনিয়া ও হায়াতুল আখেরাতের ক্ষেত্রে অভিন্ন বিষয় হলো 'আল হায়াত'।

আল হায়াতুদ দুনিয়া হলো আমাদের নিকটবর্তী জীবন। আর আমাদের এ নিকটবর্তী জীবনকে মূলত মানুষ হিসেবে আমরা নিজেরাই গড়ে তুলি। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ শক্তি দিয়েছেন এবং মুসলমানগণ এ ব্যাপারে অবগত। কিনালিযাদে আলী চেলেবির[৮] 'আখলাকে আলা' পড়লে সেখানে দেখতে পাবেন যে, তিনি শুরুতেই এ বিভাজন করেছেন। অসংখ্য আলেম তাদের গ্রন্থে এ বিভাজন করেছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সিদ্ধ (ভিত্তিগত) একটি শ্রেণিবিন্যাস।

তবে ইম্যানুয়েল কান্টের সময়ে এটা পরিবর্তন হয়ে যায়। কান্ট প্রশ্ন রাখেন যে, 'আমরা যদি এ বিভাজনকে অতিক্রম করতে চাই, তাহলে আমাদের করণীয় কী'? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এ দুনিয়ার সাথে আমরা কীভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলবো এটা আমরা জানি না'। বিশেষত এক্ষেত্রে তিনি ডেভিড হিউমের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। এক্ষেত্রে ডেভিড হিউমের সাথে ইমাম গাজ্জালীর অদ্ভুত একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে তাদের মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ

---

৭. আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে, যেটি নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সেটি মওসুফ। দুনিয়া নিজেই বৈশিষ্ট্য বহন করে, তাই মওসুফ। বৈশিষ্ট্য বা সিফাতের নাম হলো হায়াত।

৮. কিনালিযাদে আলী চেলেবি (১৫১০-১৫৭২) ১৬শ শতকের একজন প্রখ্যাত উসমানীয় আলেম, কাজী, আখলাকবিদ ও চিন্তাবিদ। তিনি ফিকহ, কালাম এবং বিশেষ করে আখলাক দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের দরুন সুপরিচিত ছিলেন। উসমানী খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কাজী পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেন এবং আখলাকী চিন্তাধারাকে উসমানীয় ও যুগের প্রেক্ষাপটে সুসংহতভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তাঁর সবচেয়ে খ্যাতনামা রচনা হলো আখলাক-ই আলাই। এই গ্রন্থটি উসমানীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশে আখলাকের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সুশৃঙ্খল সম্পর্কের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়।